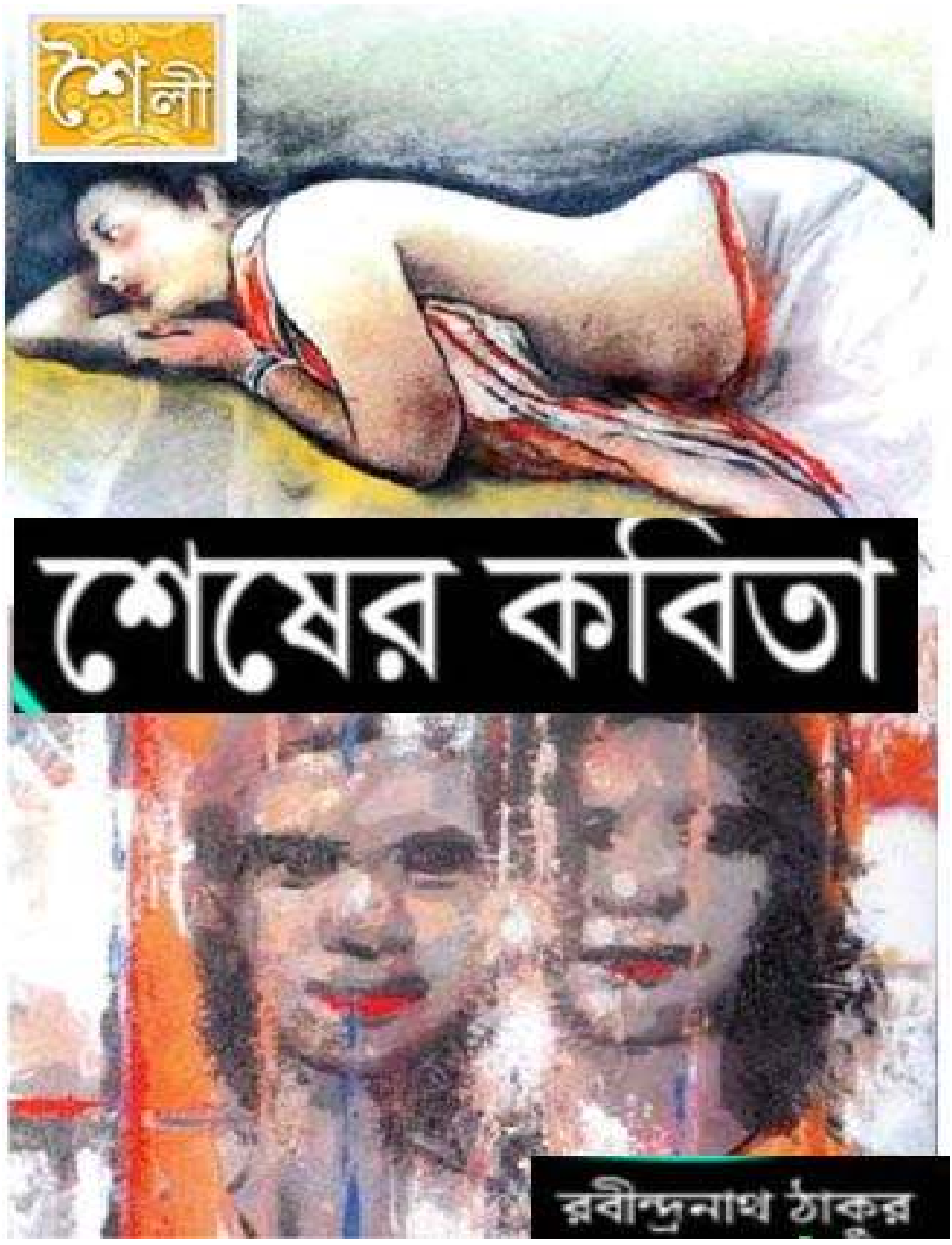
শৈলী
শেষের কবিতা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতার প্রচুর পাঠক রয়েছেন যারা, সারা জীবন 'শেষের কবিতা' ভালবেসে গেছেন, যারা সময় পেলেই চোখ বুলিয়ে নেন, আবার অনেকে আছেন যারা দূরের যাত্রাতে অবশ্যই বইটি সঙ্গে রাখবেন। তাদের ভাললাগার কথা, না বলা কথা নিয়েই আমাদের এই আয়োজন।

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাদে রায় পদবী “রয়” ও “রে” রুপান-র যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামন্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল-অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিষ্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধনস্ত তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ’র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; যেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জনওটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশেল মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল লেখা “বিষবৃক্ষে” বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা ‘‘মনোমোহনের মোহনবাগানে”, নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলার বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কাতান হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ

একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস- দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রনও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস-র বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি এ'র এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখার ষ্টাইল আছে– সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তনে-"।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না- বলত, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম,এ ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস-র, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস'লে উপসি'ত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষার ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদে আছে। পাঁচজনে মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ- কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ন পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তরে বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডানে দিকের কোমর অবধি, আসি-নের সামনের দিকটা কনুই পর্যন- দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারাই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটা থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি, পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রন থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্মৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উষ্ণ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে– কিছু আলুথালু

গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড়। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই। কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনামতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচন্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস- নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন- হালের আমদানি– ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস-ক যন্ত্রে মোড়ক করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উচুঁ খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈৎ স্বরে বলে; স-রে স-রে তোলে সূক্ষাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তারে কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষে ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন নেই, বিশেষ ভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমনীর গলা বেসুরা তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে, পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স-ব করে; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন-রেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসা আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস' থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স-ব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস-রে বললে, "গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন-কালের মধ্যে কোনাদিনই আর হবে না"।

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল; কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদবুদের উপরকার বর্নচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এই মাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন-কালের মধ্যে আর কোনাদিন ঘটবে না"।

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি–বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে আমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ"।

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না"। "কিন্তু লিল, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরন্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেকা হয়, আর যদি শকুন-লার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মূহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো"।

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মূহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই"।

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "আমি তুমি বিয়ে কর না কেন?" অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র"। সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে"।

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সি সি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়"। অমিত বলে, "আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন- এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন- তারা, হৃদয়ের বায়ুমন্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস'ঘরের মাটি পর্যন- আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না"।

অমিত বলে, "অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম,এ-তে বটানিতে ফারস্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।" অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে- ফিরপোর দোকানে যাক তাকে চা খাওয়াচ্ছে; যখন তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান ওখান থেকে যা তা কিনছে আর একে ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে; ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ বাড়িতে ও বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল; ও বলে উঠল, 'বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদের খন্ড খন্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রসি আজ যেখানে সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে- খুদে খুদে অ্যারিষ্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারো গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের পরে বিশ্বাস নেই।'

একদা মেয়েদের পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেটা নামিয়ে ফস্ করে বললে, পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।'

সভাস' অবলা ও অন্বান্ধবেরা চটে উঠে বললে, 'মানে কী হল'?

অমিত বললে, 'যে পক্ষের দখলে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধা বটে কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।'

একদিন এওদর বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতরা জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ পরে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সনে-াষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, 'কবিমাত্রের উচিত পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন-। এ কথা বলব না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরালে বলব না, আনো ফজরিতর আম; বলব, নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে। ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি; সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে,বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দা াঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই, অমরা বর্তী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুন্যদিন-ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকার চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রনালী এই রকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর- কিছু হতে পারে না। ... ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি এই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অনে-্যষ্টি- সৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাবলিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, 'সাহিত্যে থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?' 'একেবারেই। এখন থেকে কবি প্রেসিডেন্টের দ্রুত-নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো-গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা-তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরাল্জিয়ার ব্যথার মতো- খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে; মন্দিরের মন্ডপের ছাঁদে নয়; এমন কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট- বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন রাবন সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি

কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে- অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিস্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবসা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেনসকে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।.... মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন- দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ্‌ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস' নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগাবার জন্যেই তাজমহালে নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে য-কটা টুকবো উদ্ধার করতে পারলম তাই আমার উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।।

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্ত-মুখে বলে উঠল, ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো'। অমিত বললে, 'ঠিক তার উল্টো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে সব কবি ষাট-ষত্তর পর্যন- বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাসি- দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভেঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসিভর্‌স্‌ অফ স্টোল্‌ন্‌ প্রপার্টি। সে স'লে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া, শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্‌ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।' সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, 'জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।' অমিত ফস্‌ করে বললে, ' নিরাবণ চক্রবর্তী'।

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল, 'নিবারণ চক্রবর্তী! সে লোকটা কে?'

'আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।'

'ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই'।

'তবে শুনুন'।

ব'লে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে -বাধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল-

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরনীতে,
পরিচিত জনতার সরনীতে।
আমি আগনত্তক,
আমি জনগণেশের প্রচন্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুৎসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।
শুনিবে না।
মুঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্ত ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে-
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।
পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুন্ডল।
শূন্য এ ললাটপটে লিখা
গুঢ় জয়টিকা।
ছিন্নকস'া দরিদ্রের বেশ। ???
করিব নিঃশেষ
তোমার ভান্ডার।
খোলা খোলা দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ!
বক্ষ তব কেঁপে ওঠে, কম্পিত অর্গল,

পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন- বিদারি-
‘ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান- দুরন- ভিখারি,
তোর কন্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।’
অস্ত্র আনো।
ঝঞ্চ্র নিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খন্ড খন্ড হবে
মুহূর্তে চকিতে-
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।
শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পন্ডিতে পন্ডিতে
ঊর্ধ্ব স্বরে চাহিবে খন্ডিতে
দিব্য বানী।
জানি জানি,
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান-খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ,
হেরিবে আলোক।
অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দুর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বানী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উষ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শানি-লুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস- হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভ ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়-
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পন্য টুটি
সংগোপন বর্ষনসঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল সিসি তাকে বললে,'একখানা আন- নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।'

অমিত বললে, 'অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগতবিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।'

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে।

সে বললে, 'আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে- বলা কথা বানিয়ে রেখে যাও?'

অমিত বললে, সম্ভবপরের জন্যে সব সময়ে প্রসত্তত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রসত্তত। এ কথাটাও আমার নোটবইয়ে লেখা আছে।'

‘কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।’ ‘আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো নিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মূহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।’

সিসি বললে,‘আমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।’

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেই যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কণ্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতের হৃদয়টার ‘পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্রাকটিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনোর মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে,‘যেতে হয় একলা যাও আমরা যাচ্ছি নে।’

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে, দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে; দুদিন না যেতেই বুঝলে জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিষ্ট না; মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে দিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওয়ার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস-র। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্জের বাংলা ভাষার শব্দতত্ব, লেখকের সঙ্গে মতান-র ঘটবে এই একান- আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিনীর একেঘেয়ে আলাপের মতো-ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস-র আছে, কিন্তু এক নেই-তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতের আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানা প্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই সি’র হয়ে জমে জমে ওঠে-ঝর্ণা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি এমন সময়ে আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নব-বর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; একবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিনীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কুলছাড়া করবে। সি’র করলে এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদুত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য

অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো,চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সে দিন সে পরল হাইলাণ্ডরি ?? মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নর্‌ফোক কোর্তা হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না, মনে হতে পারত রাস-া তদার করতে বেরিয়েছে ডিসস্ট্রিকট্ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস-া ডান দিকে জঙ্গল ঢাকা খদ। এ রাস-ার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দুতটাই প্রশস- তার মধ্যে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে, আর চালকের হাতে একখানি ঠিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে, আগামী বঃসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস-া দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে দেহলীদত্তপুষ্পা যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবনি-কা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুনচারিনীই হোক, ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে, আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে- পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুঃরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি- চারি দিকের সমস- হতে স্বতন্ত্র। মন্দর-পর্বতের নাড়া-খাওয় ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী সমস- আন্দোলনের উপরে-মাহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস- ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন-, দু হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধন-হীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কট্‌কি কাজ করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বন্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সা,নে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শানি-র অপেক্ষায়।

তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, 'অপরাধ করেছি।' মেয়েটি হেসে বলর, ''অপরাধ নয়, ভূল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।''

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে মেয়েটির কন্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস-। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট্রইখানা খুলে লিখলে, এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে- নিকোটিনের ঝাঁঝ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।'

মেয়েটি নিজের ক্রটি ব্যাখ্যা করে বললে,'একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস-ায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস-া হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন- না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না, তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল'।

অমিত বললে, 'উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কু-কীর্তি।'

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, 'লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু' গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।'

অমিত বললে, 'আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেই খানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

'দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।'

'দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ'।

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে,'আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই- বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়, এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন- পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে জগতে অন-ত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই'।

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস-ৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের হথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ ঁেবধে দিলে। সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ-যে রাে্ত্রের জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচন্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য নক্ষত্রের আগুন জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস'ানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে,'কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তামার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।'

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, একনি আসতে পারি। সংকোচ বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোটবই নিয়ে লিখতে লাগল,'পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস-ায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে- লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে এক সঙ্গেই চলেছে। এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগল-চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকিতে দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, 'কোথায় আছ নিবারুণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার পরে-বানী দাও, বাণী দাও।'

বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারুণ চক্রবর্তী বলে গেল-

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রনি'
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।
নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেন্ড্রন্গুচ্ছ।
নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডান-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কুজনে দুজনে তৃপ্ত।

আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এই খানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষায় প্রথম পর্যায়ে চন্ডীমন্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকের। তিনি সেকালের লোক, কিন' তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপটা বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠান্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয় শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ন যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন-রে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল; হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনা মূল্যে ঋষি-বাক্য-বর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্চিদ করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান , কন্যাদায়-পিতৃদায়-মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান-রে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে পড়া একই হোটেলে-চপ-কাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়-জ্জের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলে ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এরঁ বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান- লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান-রক্ষানীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্টপ্রানালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়-ঝড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত-প্রাক্- বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেল্ফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসরবিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন, এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অনি-মকাল পর্যন- ছিল। এই পৌরণিক

লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান-রত্ন, এঁদের সভাপন্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন- ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, মা এ-সমস- ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস-কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর, আমরা এ-সমস- বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলট-পালট করতে দুঃখ বোধ করি না- তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব'।

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রাহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান-রত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন- থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটো বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান-রত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে বলতেন, মা, সমস- শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।' এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে বাধ্যতামূলক।

স্বামীর মৃত্যুর পরেই তার ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু' সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতের দেখা।

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কলেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়। মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস- ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে- খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে- বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না।

তিনি এত দূর পর্যন- ভেবে রেখেছিল যে, লাবণ্যের নাই-বা হল বিয়ে, পান্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠ-বাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারো দেখা যায় না। প্রশস- কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস- হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচ নত হয়ে যেত। এই সংকোচর অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যের বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেন্সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটরার ভিতর থেকে, গোলাপ-ফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটা লাবণ্যেই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে, ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গন্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনা মূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে। টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়।

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ বৈদাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিষ্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস'ানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপ-ফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসাই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শানি- পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল কারে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায়

নিয়ে গেল। দুর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন-র্যামী ছাড়া কেউ জানত না। বি.এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স'ান লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘবদুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির পরে অবণীশের অত্যন- শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেক দিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপনেই। তবুই শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া-সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন- শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম.এ পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত- তার বদলে আপন পরীক্ষা পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ হরে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচন্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাস-বোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স'ানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ সে নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন'ব্যুহ ভেদ করে তাঁর পান্ডিত্যের প্রাকার ডিঙ্গিড়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল।

পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন' তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন-া পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মর্ডান রিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে অনুদ্ঘাটিত বইয়ের সামনে সি'র হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস'ূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস- হয়ে ওঠেন, কিন' জ্ঞানীর স'পাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী।

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে শোভনলালকে তার মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসাতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার পরেই রাগ ধরল-নিজের উপরে, ননীগোপালের পরে।

এমন সময়ে শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়।

তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন; বললেন, পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান- ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করেৎ,'কেমন আছ, যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতুহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্যে ওর অত্যন- ঔৎসুক্য। কিন' এ পর্যন- কোনো কথাই হল না, গায়ে পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না- বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস- হয়ে উঠে কী করাবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে,'আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?'

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

'আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?'

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে,'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনি যাচ্ছি।'

এমন উত্তর পর্যন- দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস- সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস-া ??? পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেসে ফসকে যায়, তখন সেটা না ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার

বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান- অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষকৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তারপর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে।অ অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, 'আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ।'

লাবণ্য বললে, 'আমাদের সম্বন্ধে কোনোকালে যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা। যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদনি রেখো।'

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পাড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন' মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হয় না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাছে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নাড শর আমল পর্যন- এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে- গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন' হাওয়ার চেয়ে স'ূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস- ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল, আর সমস- কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন- নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে, জাগো। লাবণ্য এক মূহূর্তে জেগে ওঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস-বরূপে দেখতে পেলে- জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝ-খানটাকে ভ্রমরেরমতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবন্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা ওলটানো তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির-পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডান এর কাব্যসংগ্রহ। অকসফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ

দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল। এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা টিলে মলাটের টেকসট বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতুহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস'র ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মূহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে, আর সমস- শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন-রে অন-রে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কত দিনের ধুলো পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগাল। সে মনে মনে বললে, আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবিভাব।' চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন' বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টসটস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেস্টন করে সমস- দেহ সমবত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তার পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল। প্রথম পরিচয়ের পরে যোগমায়া বললেন,'তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।' অমিত বললে,'আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা' যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আছেন।' অমিত বললে,'ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।' 'মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা?' 'ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি বকুনির অন- থাকত না, বলতেন- এটা বাঁদরামি; গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন-ছেলেমানুষি।' যোগমায়া হেসে বললেন,'তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।' অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'এই জন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি- গাড়ি ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন-এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।' যোগমায়া হেসে বললেন, 'কর্মফল কার বাবা? তোমার না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যাবসা করে তাদের? ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙ্গল চালিয়ে অমিত বললে,'শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস- বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পবে?' যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন, এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই

বললেন,'বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস- করে আসি গে। দ্রুত তালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, 'মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।' লাবণ্য বললে, 'আমি তো জানি আপনার নামা অমিতবাবু।' 'ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না'। লাবণ্য হেসে বললে, 'ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন' অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।' 'আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। জবষধঃরারঃু ড়ভ ঘধসবং প্রচার করে আমি নামজাদা হব সি'র করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই, আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়'। 'আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?' 'একেবারে সমুদ্রের ও পারর ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষন লাগে।' 'দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।' 'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস' কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।' লাবণ্য বললে,'সহজ নয়, সময় লাগবে।' 'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই, ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।' লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার কিন' স্নানের জল ঠান্ডা হয়ে আসছে।' 'ঠান্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।' 'সময় আর নেই, কাজ আছে।' বলেই লাবণ্য চলে গেল। অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কি রকম একটি চেহারা ধরে উঠেছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস-টা বুদ্ধিতে পরিব্যপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে কেবল বেদনা শক্তি নয়, সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে, শিখেছে, কিন' শানি- পায় নি- লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শানি-র রূপ দেখেছিল যে শানি- হৃদয়ে তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকাঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা পাহাড়পর্বত সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়-তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে- এককথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কিন' হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে

সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধে। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝলরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ও পার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে-আগুনে-স্বালা যে সব রঙ্গের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই। তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শেওলা ধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স-রে স-রে ঝরা পাতার সুগন্ধঘন আস-রণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে। যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যেও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন' যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুন্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে তার কারণ, দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপসি'ত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়,তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুইটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিল যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন' দৃষ্টি তীক্ষ্ন, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনাই উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস-তর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস'া করলে, তাকে সকালে এক ঘন্টা এবং বিকেলে দুঘন্টা ইংরেজি সাহিত্য-পড়ায় সাহয্য করবে। শুরু করলে যাহায্য-এত বাহুল্য পরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াতে বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল, অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়াই চলে। যতিশংকের অধ্যাপনার ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস' অবস'ায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিত রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘন্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল। কিন' আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন-র্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙ্গে- তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে গড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন' সময় চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে, বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ। এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন' পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবন্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন- লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়তে

দৌড়তে তার পাশে উপসি'ত। বললে,''জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়।'' ''কিসের অসুবিধা।'' অমিত বললে, ''যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা ঊর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন' ডাকি কী বলে। দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন'ষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।'' ''না ডাকলেই চুকে যায়।'' ''বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।'' ''কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।'' ''মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপসি'ত হয় না। কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন- পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।'' লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে,''নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি সে।'' অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে,''চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো। এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না– সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।'' লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ''ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?'' অমিত বললে,''জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন-কি, তারা গানও গায়।'' লাবণ্য হেসে উঠে বললে, 'আশ্চর্য!' অমিত বললে,'হাসছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।' লাবণ্য বললে,'আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।' অমিত বললে,'দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন' এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস-ই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।' লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে।' ''এর জবাবে খুব-একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো, ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন ফোটা ভুইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস নতুন করে আবিষ্কার।'' কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে। অমিত বললে, ''আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর ধরা গোল লন্ঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার,

আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না। এক এক সময়ে এমন অবস'া আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।'' লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, 'বের করতে পেরেছেন?' ''হাঁ, পেরেছি।'' লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, 'লাইনটা কী বলুন-না।' '' ঋড়ৎ এড়ফ'ং ংধশব, যড়ষফ ুড়ঁৎ ঃড়হমঁব ধহফ ষবঃ সব ষড়াব! '' লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে,'আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।' লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, হাঁ। অমিত বললে,'সেদিন আপনা টেবিলে ইংরেজ কবি ডনের বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।' ''আবিষ্কার করলেন?'' ''আবিষ্কার নয় তো কী। বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাবলিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডনের কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়, বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডনের কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি- দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্। ভালোবাসিবারে দে আমাকে অবসর। লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,'আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি।' ''ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কান্ড করে বসবে, পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।' 'লড়াই? কার সঙ্গে।' 'সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস- কিছু একটার জন্যে একখুনি চোখ বুঝে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।' লাবণ্য হেসে বললে,'প্রাণ যদি দিতেই হয় তে সাবধানে দেবেন।' 'সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমার বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেশি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব'যুদ্ধং দেহি-ঐ যে লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নিলর্জ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।'' লাবণ্য হেসে বললে,'লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?' ''তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব, এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।- বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।' লাবণ্য হেসে বললে,'আপনি যখন যুদ্ধের প্রস-াব করেছিলেন মনে হয় হয়েছিল, কিন' ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস- হলুম যে ভাবনা নেই।' অমিত বললে,'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?' ''কী, বলুন।'' ''আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বাড়াবেন না।'' ''আচ্ছা, বেশ তার পরে?'' ''ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যতলা পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।' 'লাবন্য হাতে বাঁধা ঘড়িটাকে দিকে চেয়ে বললে,'কিন' সময় যে অল্প।' ''জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্যদেবী, সময় অল্প।

মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান-ই করা চাই। সময় যাদের বিস-র তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয় শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস- যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে'ভবে এসে করলে কী তখন কোন লজ্জায় বলব,'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি। তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে। ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কোরো যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবর্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস-াবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, চলুন। ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর একপাশে দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিবারণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কন্ঠরোধ হয় সেই দশা। অমিত বুঝতে পারলে, একটা কিছু বলাই চাই। বললে,'আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা-একটা সাধু, আর একটা চলতি। কিন' এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল-সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা এইরকম জায়গার জন্য। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অন্যায়সেই কন্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?' লাবন্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল। অমিত বললে,''চায়ের টেবিলের ভাষায় কোনটা ভদ্র, কোনটা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন' এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।' দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা। অমিত ভূমিকায় বললে, 'রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।' ''হাঁ, লাগে।'' ''আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাঁপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে; তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।' ''আপনি এত ভয় করছেন কেন।'' ''এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনাকে জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।'' ''আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি না।' 'এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক- রে অচেনা,

মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে? বিষয়টা দেখছেন? না চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন্ না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে রাত্রি যবে সবে হয় ভোর, মুখ দেখিলাম তোর। চক্ষু'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে।

নিজেকেই ভুলে থাকা মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা সহজে হবে না– কানে কানে মৃদুকন্ঠে নয়। করে নেব জয় সংশয়কুন্ঠিত তোর বাণী– দৃপ্ত বলে লব টানি শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে নির্দয় আলোতে। একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনায় পৌরুষ। জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে, মুহূর্তে চিনিবি আপনারে, ছিন্ন হবে ডোর– তোর মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামাজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমন্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ব।''– লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে–

''হে অচেনা, দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না, তীব্র আকস্মিক বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক, তোমারে চেনার চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি, দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।''

আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না। এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেই ভূলে গেল।

অমিত যোগমায়র কাছে এসে বললে, 'মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।'
'পছন্দ হবে তবে? আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।'
অমিত বললে, 'নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।'
' তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।
' অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মানরক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্প বিবাহ, বহুবিবাহরে মতোই গর্হিত।'
' আচ্ছ, নামটা না হয় খাটো হল, রূপটা।'
' বলতে ইচ্ছো করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।'
' অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?'
' পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই- নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।'
' আচ্ছা।, নামরূপ থাক বাকিটা?'
' বাকি যেটা রইল সব জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা, লোকটা অপদার্থ নয়।'

‘ বুদ্ধি?’
‘ লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।’
‘ বিদ্যে?’
‘ স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞান সমুদ্রের কুলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।’
‘ পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।’
‘ অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।’
‘তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।’
‘জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিত কুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা? ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?’
‘ সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন- ঠাট্টাই হবে ওঠে।’
‘ এস সন্দেহটা পাত্রের পরে দোষারোপ।’
‘ বাবা সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।’
‘মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ; দয়মন-ী সে কথা বুঝেছিলেন।’
‘ আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?’
‘ কিরকম পরীক্ষা চান বলুন।’
‘একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।’
‘ কথাটাকে আর একটু ব্যাখ্যা করুন।’
‘ যে রত্নকে সস-ায় পাওয়া গেল তারও আসল মুল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।’
‘ মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সুক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়ে ছেন কিন’ কথাটা আসলে মোটা, জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমনীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুনে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস’ায় সাধারন মাসিমার দাল স্বাভাবের নিয়মেই খুমি হয়ে কথনি ঠেকিতে আনন্দনাড়-কুটতে শুরু করেন।’
‘ ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরই নাও লাবন্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার বাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব, লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।’
‘আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।’
‘আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?
‘ দেখছি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।’
‘ তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।’
‘ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ন। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ

হয়েও অস'ানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?'
'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস-টা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।'
' মাসিমা, আমার মনের স্বীকার একটা স্পেসিফিক গ্রাভিটি আছ, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস'া করতে। অমিত এ ঘরে ও ঘরে ধুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল আজ তাকে ' অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা' পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, ' অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।'
অমিত পুলকিত হয়ে বললে, ' পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?
'কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব।'
' ইস্কুল- মাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।' হাঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মুল কারনটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, 'কয়দিন থেকে ছুটিতত্ব তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদনিও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।'
' সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।'
' বলেছিলে, অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদগুণ, তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না। বলেই বই বন্ধ করে তখনি বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।
যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন। শিক্ষক জাতীয় বলেই টাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।
অমিত হেসে বললে, ' কাজ উপসি'ত হলেই প্রস'ত হওয়া চাই, এই উপদেশেল বাজার দর বেশি, আকব্বরি মোহরের মতো; কিন' ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত অকাজ উপসি'ত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।'
'তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।' যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, 'জরুরী কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবন-পঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই-তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।'
যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।
ফুলে আছন্ন গোলাপের লতা; এক ধারে সুর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উত্তর প্রানে- এক মস- য়ুক্যালিপটাস গাছ। তারই গুড়িতে হেলান

দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদদুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাচে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাতা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে,

'সুখবর আছে মাসিমার মত পেয়েছি।'

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদুরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালী নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুক্তিভিখারি দলের একজন।

অমিত বললে, 'যদি আপত্তি না কর, তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।'

' তা দাও।'

' তোমাকে ডাকব বন্য বলে।'

'বন্য।'

' না না এ নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এ রকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব- বন্যা। কী বল?

' তাই ডেকো, কিন' তোমার মাসিমার কাছে নয়।'

' কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।'

'আচ্ছা বেশ।'

' আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি, ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়! বন্যা হঠাৎ এল তারই কুল ভাসিয়ে দিয়ে।'

'নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।'

'ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।'

'আচ্ছা, আমি দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব-মিতা।'

' চমৎকার। পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে-বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে না হয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী?

' ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস-া হয়ে যায়।'

' সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ বন্যা।'

' কী মিতা।'

' তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাবে জান?- অন্যান্য।'

' তাকে কী বোঝাবে?

' বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই, তুমি আর-কিছুই নও।'

'সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।'

' বল কী, খুবই আম্চর্যের কথা । দৈবাৎ এক একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই

চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো; পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব–

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধণ্যা।'

' তুমি কবিতা লিখবে নাকি?'
' নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি?'
' এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?'
'কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন–, ঘুম না হলে যেমন এ–পাশ ও–পাশ করতে হয় তেমনি করেই কেবলই অকসফোর্ড বুক অফ ভর্সেস এর এ পাত ও পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস– পৃথিবী আ অপেক্ষা করে আছে।' এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে? সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'
'কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা।'
' কিন' আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে, তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন–রের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়েই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি; কত অল্পই টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হয়, তোমরা অত চেচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আসে– বলো– ঋড়ৎ মড়ফ'ং ংধশব, যড়ষফ ুড়ঁৎ ঃড়হমঁৎ ধহফ ষবঃ সব ষড়াব!
অনেকক্ষন দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবন্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, ' ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস– পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস– পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোনে এই য়ুক্যালিপটস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরামাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্যন– চীৎকার শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উচিয়ে বাকা পলিটিক্সের ফাকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান– বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।'
' কোনটা ভালো?
' ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে

লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্ব জগতের অন-রের নাড়ীতে
নাড়ীতে আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।'
লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।
অমিত বললে, ' তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমরা সব কথাকে বরখাস-করে দেওয়ার মতো।'
লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, ' তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।'
' ভয় কিসের!'
' তুমি আমার কাছে কী যে চাও, আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি, ভেবে পাই নে।'
' কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার, এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।'
' তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।'
' ধরাই তো পড়তে হবে।'
' মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দুরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না-না না, কিছু বলো না, আমার কথাটা আগে শোনা। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রনি' খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন-চলবে। তুমি কিন' নিজেকে ভুলিয়ো না।'
' বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?'
' মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ।আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটা তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল ভালগার। ওটা বড়ো রেসপেক্টবল; ওটা শাস্ত্রের দোহাই পাড়া সেই সব বিষয় লোকের পোষা জিনিসে যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিনীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।'
' বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।'
' মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যাতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন' একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না।- তাতেই আমি খুশি থাকব।'
' বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করব না। কিন' একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর পোষা অবস'ায় তার একরকম শিকলি বাঁধা স'াবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর

এক মুর্তি।

‘ আজ তুমি তার কোনটা?’

‘ যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লন্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ? লাবণ্য চুপ করে রইল। অমিত বললে, ‘ বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ-সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লন্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সে আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধরাবাহিক কিন’ আসলে সে আকস্মিকের মালা গাথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে; যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা- সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাথা পড়ল।

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, ‘ অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যের, প্রত্যেকে অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথায় উচ্ছাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রযোজন সেইজন্যেই । যে সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন’ আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।’

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, ‘ আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না যেদিন তাজমহল তৈরী শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড় প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।’

অমিত বললে, ‘ তোমার কথায় তুমি ক্ষনে ক্ষনে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।’

‘ আমি চাই নে কবি হতে।’

‘ কেন চাও না?’

‘ জীবনের উত্তাপে কেবল কথায় প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।’

‘ বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ! আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন’ কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভান্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি- ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝর্নার উপরে কবিতা কী করে খবর পেয়েছে, শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝর্না আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে-

ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,

তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

‘আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস- আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার সি’র হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস-া দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি-
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার চিরন-নী।

‘তুমি ঝর্না, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছ কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী-
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।’

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, ‘ যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি তাকা তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।’
অমিত বললে, ‘ কিন’ একদিন হয়তো দেখবে, আর-কিছু যদি না থাকে আমার বানীরূপ রয়েছে।’
লাবণ্য হেসে বললে, ‘কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?’
আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স-রে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।’
‘তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।’
এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে- খাবার তৈরি।
অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, ‘লাবন্য বুদ্ধির আলোতে সমস-ই স্পষ্ট করে জানতে চায়।

মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন-রাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে,কেউ বা করে রচনায়- জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব! এইখানেই কি মেয়ে পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস- শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস- শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর , সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল সেইখানেই মস- বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয় সে মক্ত।' একথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন' ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

যোগমায়া বললেন, 'মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?'

'ঠিক বুঝেছি মা'।

'অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়'। লাবণ্য একটু হেসে বললে, 'ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে, এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না'।

'সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে'।

'সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষি দায় যত-কিছু সব মায়ের, আর ছেলের দিকে যত-কিছু সব খেলা। কিন' আমাকে কেন বলছি, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে'?

'দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন- মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠান্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাও বল, ও তোমাকে ভালোবাসে'।

'তা বাসেন।'

'তবে আর ভাবনা কিসের?'

'কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে'।

'আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।'

'কর্তামা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন' স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে সন'ষ্ট থাকতে পারে নি- নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম-যেখানে মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব'।

'তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ; যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটাতে গিয়ে তুমি

যাকে ট্র্যাজেডি বল তাই ঘটে'।

'সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়ন-পিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন' যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝ সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স'লেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।'

'তুমি কী করতে চাও লাবণ্য?'

'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তামা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন' বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে, মাঝে ফাঁক থাকে না; তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান- নিকটে থেকে। কোন একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।'

'লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।'

'কিন' উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মান যদি ক্লান- হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান- সাধারন মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

' তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পুর্ণ মেনে নিতে পারবে না?'

' স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন' বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই নে।'

' তুমি কী চাও?'

' যতদিন পারি না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর, স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে গুটি থেকে বের হয়ে আসা-দু চার দিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী? জগতে প্রজাপতি আর কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়। নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিল আর সূর্যাসে-র আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।'

' সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতের কাছে নাহয় ক্ষনকালের মায়া রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?'

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বলেলেন, 'তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে। তোমার

মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন' তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে-দেখলুম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান-না দিয়ে আসি; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মন প্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। ' বিয়ে করব না' বলে হঠাঃ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।'

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল।

যোগমায়া বললেন,'তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমার ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।'

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে-এও তো সুক্ষ্ম; যোগমায়ার মা ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, 'কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।

যোগমায়া বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনো কালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।'

' না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর-কিছু যে হতে পারত, এ আমি মনেও করতে পারি-নে-এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান-ই শুকনো-কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটাবে। আজ হাঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল, এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই! আমাকে বিয়ে করতে বোলো না কর্তামা।' ব'লে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কোলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভুতেরই অধিকার সংকীর্ন, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলছে?'

অমিত উত্তর করলে,'উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন- খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্বাবের তপস্যা, খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শুন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা। এখন শেষ পর্যন- যদি কোন কারণে কালিদাস এসে না পৌছাতে পারেন, অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।' অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন' যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো-থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কান্ড ঘটিয়ে তুলেছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার' পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, 'মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।'

একদিন বিষম এক বর্ষনের অনে- অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টি বিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন' শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, সেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কোলকাতায় অমি কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস'ানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে।

যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন,' একি কান্ড অমিত!'

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে,' আমার ঘরটা আজ অসম্বন্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভারো নয়।'

'অসম্বন্ধ প্রলাপ!'

' অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে

উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেষ্ট্-স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি-ঘরের মিসগর্নমেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত পলিটিকসের একটা মুলনীতি একানে প্রত্যক্ষ।'

' মুলনীতিটা কী শুনি।'

' সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যত বড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস'াও ভালো।'

আজ লাবণ্যর'পর যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর ক'রে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মুর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন।-'এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী আসামান্য শক্তি। আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রানে- ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে! সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবন্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে! খামকা বলে বসলেন কিনা বিয়ে করবেন না। যেন কোন রাজরাজেশ্বরী! ধনুক-ভাঙা পণ! এত অহংকার সইবে কেন! পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'

একবার যোগমায়া ভাবলেন, অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, 'একুট বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।'

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবন্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল। বললেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।'

সে বললে,'কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।'

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস- দুপুরবেলা খাওয়ার পর থেকেই , তার মনের মধ্যে একটা অসি'র অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবইল মন বলেছে, এল বুঝি। বাইরে দম্কা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছট্ফট্ করে। আর, দুর্দান- বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝর্নাগুলো এমনি ব্যতিব্যস- যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবন্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান- হয়ে উঠল-যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতের দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান-রে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস- আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান-র ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায়-আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা অমনি মস- করে, স-ব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন' প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তান্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলেয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চয়ে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে আঘাত করে। এই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুন্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে

না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস- পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে , শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। ‘ আমি ভালোবাসি’ এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখির মতো, কত দিন থেকে, কত দুর থেকে আসছে-সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি-আমার সমস- জীবন, আমার সমস- জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল ‘সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই’!

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ ক’রে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান- হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে; তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি। এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন, বেড়াতে যেতে। ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন,

‘ সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস?’

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, ‘ এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা?’

‘ যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বলো-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।’

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

‘ এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম, বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে! ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কত বড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না?’

চেষ্টা করে রুদ্ধ কন্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, ‘ আমার ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চার্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে?’

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শানি-, এত বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল! তাকে আসে- আসে- বললেন, ‘মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে; সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও-একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোন অভাব থাকত না। চলে মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।’

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে একতাড়া খবররে কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিসে- ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মাজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা আকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নান রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো; সেদিন নিজের অসি-ত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে? অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁেচ; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন- একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়েছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,'এ কী অন্যায় মাসিমা।'

'কেন বাবা কী করেছি?'

'আমি যে একেবারে অপ্রস-ত। শ্রীমতী লাবন্য কী ভাববেন'।

'শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন?'

'শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা'।

'এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা?'

'নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্যদেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।'

' দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।'

' এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই লাইফ্স্ কমেন্টারি ইন ভারস॥ অতিথি বিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি সে লেখাটা কোনো কবি সম্রাটের নয়।-

পুর্ণপ্রাণে চাবায় যাহা
রিক্ত হাতে চাস যে তারে,
সিক্ত চোখে যায় নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পুর্ণতা, তার যা আকাঙ্কা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।-

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্য-বদল তখন হবে
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের ধারে?

সেইজন্যেই তো সমপ্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী? এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকি কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বলেছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।-

পুষ্প উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্য-ধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকার।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম নাম দেব মাসতুতো বাংলো।'
' বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তাপস্যা ঐশ্বর্যের , দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটিরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। 'বর পাই নি' বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে মনে নিশ্চয়ই জান, পেয়েছ।'
এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যের গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাতে বেঁধে বললেন, 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।'
অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, ' তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।'
ব'লে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'আজ তুমি সমস- দিন গেলে না কেন?'
অমিত উত্তর দিলে, 'কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না ব'লে বাদলের দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে; বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা। কিন' সেটা অন-রের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ? সে অকুল কোনোকালে কি পার হব?-

ঋড়ৎ বি ধৎব নড়ঁহফ যিবৎব
সধৎরহবৎ যধং হড়ঃ ুবঃ ফধৎবফ ঃড় মড়,
অহফ বি রিষষ ৎরংশ ঃযব ংযরঢ়,

ড়ঁৎংবষাবং ধহফ ধষষ.
আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি।
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন।
ডুবুক সবি, ডুবুক তরী

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?'
'হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস- দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দুরে থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।'
' বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে- না জানার একটা প্রকান্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল-তারই উপরে আলো ঝলমলকরে, সমস- আকাশের ছাষা পড়ে, আজ সেই খানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপুর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনী; একে থামায় কে?'
'মিতা, তুমি আজ সমস- দিন কী করছিলে?'
' মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস-ব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম, কোথায় সেই কথা আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবইল বলেছি, কথা দাও, কথা দাও।

ঙ যিধঃ রং ঃযরং?
গুংঃবৎরড়ঁং ধহফ ঁহপধঢ়ঃঁৎধনষব নষরংং
ঞযধঃ ও যধাব শহড়হি, ুবঃ ংববসং ঃড় নব
ঝরসঢ়ষব ধং নৎবধঃয ধহফ বধংয ধং ধ ংসরষব,
অহফ ড়ষফবৎ ঃযধহ ঃযব বধৎঃয.
একি রহস্য, একি আনন্দরাশি!
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি-
পুরোনো সে যেন এই ধরনীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাঃ করতুম-

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া!

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়? উপরে চেয়ে কখনো বলি 'কথা দাও' কখনো বলি' সুর দাও'। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন' পথের মধ্যে মানুষ ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসে- হয়তো বা তোমাদের ঐ বরি ঠাকুরকে।'
লাবণ্য হেসে বললে,' রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে

তাঁকে স্মরণ করে না।'

'বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনসুন নেমেছে। ওয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক এক দিন কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কোলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগামায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন' 'মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে তুমি ওকে প্রণাম করো।'

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্খা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, 'বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।'

লাবণ্য বললে, 'কী দরকার মিতা!'

'তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন' হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা; ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বাচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো; সে কথাটি শুধু এই' পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায়, মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক- না। লাবণ্য বললে, ' আচ্ছা, তাই থাক।'

' কোলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।'

' আমি কোনো পাথর চাই নে, একটি মাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।'

' আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।'

ঠিক হয়ে গেল আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কোলকাতায় গিয়ে সমস- আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, ' তোমার কোলকাতায় ফেরবার দিন অনেক কাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের

' এমন কড়া শাসন কেন?'

' সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।'

' এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একবারে হঠাৎ এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে, যেন মেঘনাদবধ- কাব্যের সেই চমকে-থেমে-যাওয়া লাইনটা-

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে!

শিলঙ থেকে আমিই না হয় চললুম, কিন' পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস করে পালাবে না। কোলকাতায় গিয়ে কী করব জান?'
'কী করবে।'
' মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস'া ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নুতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন?
' লাবন্য বললে, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'
অমিত বললে, ' সেই ললিতকলা বিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।'
' মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।'
' আচ্ছা তবে শোন। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস-া করা নিজেকেই ঠকানো। কেনান, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।'
' দামের হিসাবটা শুনি।'
' রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মন্ড্হারবারের ঐদিকটাতে। ছোটো একটি ষ্টীম লঞ্চ ক'রে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে কোলকাতায় যাতায়াত করা যায়।'
' আবার কোলকাতায় কী দরকার পড়ল?
' এখন কোন দরকার নেই সে কথা জান। যাই বটে বার লাইব্রেরিতে-ব্যাবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই, তাই মনে নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন' বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে-জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরম ও নয়, খাদ্যও নয়; কিন' ঐ শক্তটাই সমস- আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কোলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।'
' বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কোলকাতায় যেতে হবে-দশটা- পাঁচটা।'
' দোষ কী? কিন' পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।'
' কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনেয়?'
' না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারোআনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।'
' আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তর পর?'
' স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার; পাড়ির নীচ তলা থেকে উঠেছে বুঝি নামা অতি পুরোনো

বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকা বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল ধরা, কিছু কিছু ধসে যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপছিপে নৌকাখানি তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম বলে দাও তুমি।'

' বলব? মিতালী!'

' ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালী। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল; কিন' তোমার কাছে হার মানতে হল। বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পরে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।'

'রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আজ জানালায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব?'

'দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।'

'দীপক।'

'ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশার করব। এমন হওয়া চাই, সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বারট্রান্ড্ রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহুত তোমার বাড়ীতে কোনোমতেই যেতে পারব না।'

' আর তোমার বাড়িতে আমি?'

' ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন' মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যকিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।'

' নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।'

' তা হোক, কিন' আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।'

' আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?'

' তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পুণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির খন্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।'

' এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।'

' আচ্ছা বেশ।' পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে-

ইষড় ি মবহঃষু ড়াবৎ সু মধৎফবহ
ডরহফ ড়ভ ঃযব ংড়ঁঃযবৎহ ংবধ,
ওহ ঃযব যড়ঁৎ সু ষড়াব পড়সবঃয
অহফ পধষষবঃয সব.
চুমিয়ে যেয়ো তুমি

আমার বনভুমি
দখিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম-
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ।

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।
অমিত বললে, ' এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কত দুরে এগোল।'
লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে,'না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।'
লাবণ্য লিখে দিলে –

মিতা, 'মসি মম জীবনং, ' মসি মম ভূষনং,
' মসি মম ভবজলধিরত্নম্।

অমিত বইটাকে পকেটে পুরে বললে, 'আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমুলকাঠই হোক আর বকুল কাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।'
লাবণ্য বললে, 'নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?'
অমিত বললে, ' সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির্ ঝির্ করে ঝাউগাছ গুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছে।
তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যার আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী? মিলনের জায়গার ও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাধানো চাঁপতলায়, কোনদিন বাড়ির ছাতে, কোনদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতের কাজ করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ। সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধুপ।..... পূজোর সময় অন-ত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন' দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে। এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল! এখন তোমার কী মত?
'মেনে নিতে রাজি আছি।'
' মেনে নেওয়া, আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ের যে তফাত আছে বন্যা।'
' তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না'ও যদি থাকে, তবু আপত্তি করব না।'
' প্রয়োজন নেই তোমার?'
' না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দুরে। কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দুরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন' আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেই জন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল

করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।'
অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ' তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কোলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসের উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে-দুরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সারক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে-, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে-দু হাত তফাতে। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হসে-, তাতে লেখা থাকবে-

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা?'
' কিছু না মিতা। কিন', এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে?'
' আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধু তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ঐ ইংরেজী কবিতাটাকে কোলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্সে এম.এ পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধুকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন' ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।'
' তোমারও ছাদে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন' তোমার নববধু কি চিরদিইন নববধু থাকবে?'
টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, ' থাকবে, থাকবে, থাকবে।
যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী থাকবে অমিত? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।'
' জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধু দুর্লভ কিন' লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।
' একটা দৃষ্টান- দেখাও দেখি।'
' একদিন সময় আসবে, দেখাবে।'
' বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।'

আহার শেষ হলে অমিত বললে, কাল কোলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।'

'আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব?'

' খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই ব'লে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়; যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল, এ যে যুগ-বদল, তার মাঝখানে একটা কল্পান-। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নতুন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনমুতি দাও, লাবন্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রনাম জানিয়ে যেতে চাই।'

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছু দুরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস- সূর্যের শেষ আভায়। সেই খানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যের চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুরু অনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খেলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে। অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'চলো এবার।'

কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যের মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল। বললে, 'কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।'

' কেন আসবে না।'

' আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল-ইতি প্রথমঃ সর্গঃ আমাদের সয়ে বয়ে স্বর্গ।'

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স-ব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শিষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে বলে, 'তুমি আমাকে ধণ্য করেছ।' কিন' সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, 'বন্যা আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।' লাবণ্য একটু খানি ভেবে আবৃত্তি করলে-

' তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,

নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছু-ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।'

'বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলাবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।'
' ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লানি- আসে না, ম্লানতা আসে না; এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?
' কিন' আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়?'
' রবি ঠাকুরের।'
' তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।'
' বইয়ে রেরোয় নি।'
' তবে পেলে কী করে?'
' একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে বক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য। এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।'
' আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।'
' সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।'
' তাকে দয়া করেছ?'
' করবার অবকাশ হল না; মনে মনে প্রার্থনা করি-ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।'
' যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।'
' হাঁ তারই কথা বৈকি।'
' তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল?'
' কেমন করে বলব? ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে-

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।'

অমিত লাবণ্যের হাত চেপে ধরে বললে, ‘ বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়, কিন’ কেমন একটা বয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল?’

‘ একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতা দুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।’

‘ সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই?’

‘ কেমন করে বলব? কিন’, এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছে, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।’

‘ বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।’

‘দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দর মহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।’

‘ তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস- একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।’

‘ আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথশেষের কবিতাটা শুনে নিই।’

‘ রাগ করো না বন্যা আমি কিন’ রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।’

‘ রাগ করব কেন?’

‘ আমি একটি লেখককে আবিস্কার করেছি, তার স্টাইল-’

‘ তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কোলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।’

‘ সর্বনাশ! তার বই! মে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন’ কখনো বই ছাপাতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো-’

‘ ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যে ভাবে বোঝ আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।’

‘কেন?’

‘ আমার ভালো-লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কোলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।’

‘ আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝকানে বড়ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে

গেল।'

' কিচ্ছু খারাপ হয় নি, হাওয়া ঠিক আছে।'

অমিত তার কপালের চুল গুলো কপালের থেকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল-

' সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদুর শৈলশিখরানে-,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিকভ্রান্তে।

বঝেছ বন্যা? চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত হোবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার' পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।-

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের' পরে
আধেক আলোকরেখা- রন্ধ্র।

ওর এই আধাখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস- রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্র্যান্ড্।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুন্ন।

কিন', এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড্ডো বেশি; যে নদীর জল মরেছে তার মন'র স্রোতের ক্লানি-তে জঞ্জাল জম্ে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে-

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন', এই ক্লানি-তেই কি ও শেষ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগনে-র ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল।-

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তুর্ণ।

স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দুতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে।–

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু, চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ন করে দেবে। এর মদ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে। তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।'
' রাগ করো কেন মিতা? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বার বার বলে লাভ কী?
' তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি-'
' ও কথা বোলো না মিতা। আমার ভালো লাগা আমারই তাতে যদি আর কারো সঙ্গে আমার মিল হয়, বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ? নাহয় কথা রইল, তোমার সে পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।'
' কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।'
' রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।'
' ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।'
' একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন- নেই।
' আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন' বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠান্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।'
লাবণ্য হেসে বললে, ' আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুলডগের মতো ধুতির কোঁচাটা দুলছে।

দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোনটা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।'

' তা মানতেই হবে। পক্ষপাত জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স'লেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। এই অভ্যাসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাকগে আজ নিবারণ চক্রবর্তী ও না , আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা-বিনা তর্জমায়।'

' না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারো নয়।' অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, ' জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।'

' তাকে কি সে বরাবর সন'ষ্ট থাকবে?'

' না থাকে তো তাকে কোন মলে বিদায় করে দেব।'

' আচ্ছা, কান মলার কথা পরে সি'র করব, এখন শুনিয়ে দাও।' অমিত আবৃত্তি করতে লাগল-

' কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী!
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছে মোর ভাগ্য-পথের ধুলিরে!
আজ যবে
দুরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলে,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধুমের কুন্ডলী!
কতবার ক্ষনিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে!
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন

জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।'

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যের পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেই উপর। কেননা, যে রাস-ায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপটাস তলায়। হাতে দুই -একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খেলা, কিন' বেলা যায, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে- জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দুত আকাশ ঝেটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন- পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়; অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।
এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুমদম শব্দে ঘরে ঢুকেই ' মাসিমা মাসিমা' করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যাথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টি বিন্দুর ভারে সদ্যঃতপী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবন্যকে ডাকেন নি। বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।
লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে

যোগমায়া ভাড়ার ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘ কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি?’
‘ ভুমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।’
অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদবিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ খবর সব ভালো তো?’
লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, ‘ আজই সন্ধ্যাবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির , আর তার দাদা নরেন।’
‘ তা, ভাবনা কিসের বাছা? শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান- না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না?’
‘ সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি! তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।’
‘ আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরকেই।’
‘ না মাসি, আমার প্যারাডাইস্ লস্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায় । সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখ স্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।’
কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এদদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দুরে। এক মুহুর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কোলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মুর্তি ছিল না। কিন’ এই-যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটাতেই লাবণ্য বুঝলে, যে বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।
লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, ‘ আমি হোটেলেই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন’ এইখানেই আমার আসল বাসা।’
অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করেছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন’ ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়। তখন ভাবে নি, কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদবেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকছিল; লাবণ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।
অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘ তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?’
লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, ‘ না, সময় নেই।’
যোগমায়া ব্যস-া হয়ে বললেন, ‘ যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।’
লাবণ্য বললে, ‘কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোর বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।’
ব’লে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।
লাবণ্যের এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচতি। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।
অমিতও নীরস কন্ঠে বললে, ‘ আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা

চাই।'

এই ব'লে চলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স-ব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, ' বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালাটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, এ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালিক অবাক, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিস্কার করে থাকব। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।'

লাবণ্যের মুখে গভীর একটা বিষাদের ছাড়া পড়ল। বললে, ' আর কারো কথা অত করে তুমি ভাব কেন? নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, ' বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালী নাম ওকেই সাজে।'

' ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও, দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্রের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পর শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।'

' বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা; সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরী করি তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি ভুত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে ' সৃষ্টি করো' সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দারকার থাকে না। কিন' তাই বলে ঐ ছেড়ে যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান -মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই-ওরা কি একজন মাত্র? সেই জন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শুন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে। সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোষ্টকার্ডে লেখা-

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর।
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব

বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীবর।
কে বলে, তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল?
যার নাই, যার নাই-
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহবানে
উদার তোমার দ্বার -পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব দরজা খুলবে না?'
' মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী? কিন', তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু কোরো না, অন-ত তার মরার জন্যে অপেক্ষ কোরো।'
অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্ একটা উদবেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।
অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্ধ কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন', সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেই ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, 'তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে আপাতত সে হচ্ছে হোটেল পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।'
তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পারো। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।'
এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল। অমিত কিছুক্ষণ স-ব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইল। তারপরে আসে- আসে- যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্টাস-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটা কতক ভাঙা কোলা ছড়ানো। দেখেই ও মনটার ভিতর কেমন একটা ব্রাথা চেয়ে সকরুন। তার পরে দেখলে ঘাসের উপরে একটা বই , সেটা রবি ঠাকুরের ' বলাকা'। তার নীচের পকেটে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে. কনি' ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো ধোওয়া বাসাতে অত্যন- স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাপালার সীমান-গুলি যেন ঘন নীল আকাশে পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়েরর আর গাছপালার সীমান-গুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আসে- আসে- বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর। এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যের পণ ছিল, তবু যখন দুর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় ব'সে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছল্ছলিয়ে।

কাছে আসে বললে, 'মিতা, তুমি কী ভাবছ?
' এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উল্টো।'
' মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তোমার উল্টো ভাবনাটা কিরকম শুনি।'
' তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস করা একটা পথের ছবি-অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়ালা লম্বা লঠি, পিঠে আছে চামড়ার ষ্ট্যাম্প দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।'
' ডায়মন্ডহারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পচাত্তর টাকার ঘর বেচারাও গেল। তা, যাক গে। কিন' চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস'াটা কি রকম করবে? দিনানে- তুমি এক পান'শালায় ঢুকবে আর আমি আর একটাতে?'
' তার দরকার হয় বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে থাকাটাই বুড়োমি।'
' হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা?
' তবে বলি। হাঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ ওয়ালা? ভারত ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়; আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।'
লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, ' শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম.এ দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।'
' এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস'ানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস-া চলেছিল সেইটিকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস-া দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েনসাঙের তীর্থযাত্রা ঐ রাস-া দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশত্ পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এস ধরলে, সেখানে ফরাসি পন্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে - ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন' ভারত সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবইল পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে- কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে হিমালয়ের পূর্ব-প্রান-টাতেও সন্ধান করবেভ বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস-া এ দিকে দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। এ পথ খেপাটার কথা মনে করে আমারো মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথায় রাস-া খুঁজে খুজেঁ চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।- আমার কী মনে হয় জান?'
' কী বলো।'

‘ প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন কাঁকন পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস- কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন’ একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, না না কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানালার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন- জারুল গাছের আড়ালে-ঠিক সেই সময়টাতে কোন একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে চলে গেল। বুঝতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোনখানে অত্যন- একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে থইয়ে দিতে চায়।’ লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায় হলদেয়-মেলানো একটা বুনো ফুল। একান-মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল। অমিত বললে, ‘ জান, বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।,

‘ কমন করে?’

‘ আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুন্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধুসজ্জা খসিয়ে ফেললে; বললে এখানে জায়গা হবে না বন্ধু , চিরদদিন ধরে আমাদের সপ্তপদী- গমন হবে।’ বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য উঠে পড়ে ক্লিষ্ট স্বরে বললে, ‘মিতা, আর নয়, সময় নেই।’

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালি জানে। গর্ভনমেন্টের অফিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকা ভাগ্যগগনে ‘ কোন গ্রহ রাজার হৈল কেবা মন্ত্রিবর।’ এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবরেন জ্যোতির্মন্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফাস্ট ম্যাগ্নিট্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিস্কের আগ্নেয় নাট্যের নানা প্রকার ব্যাখ্যা চলছে। পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুকুজ্জে-অ্যাটর্নি। সঙক্ষেপের কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রাগোষ্ঠীর অন-শ্চর নয় সে, কিন’ জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধুমকেতু মুখো না দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদে দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদর কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন’, সিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবলবেগে এর পচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন’ দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না। অমিত শিলঙের রাস-ায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দুর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজো যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকট ভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধুমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূরে থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে ধুমকেতু বুঝি সেটা বঝতে পারে নি। কিন’ দেখেও দেখতে না পাওয়াটা টকেট বড়ো বিদ্যের অন-র্গত। চুরিবিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার

প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে খেবার পারদর্শিতা চাই। কুমার মুখো শিলঙের বাঙালি সমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে ' অমিত রায়ের অমিতাচার'। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতিশোধনের জন্য কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই সি'র ছিল, কিন' জনশ্রুতিবিস-ারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচ দিনের মধ্যে কোলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুট-ধুমাকৃত অত্যুক্তি-উদ্গারে সিসি- লিসি মহলে কৌতুকে কৌতুহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদর করলে। অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এতক্ষনে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন' যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্পতিসহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল কিন' অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কোলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজী যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিকে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন কি, তারযোগে অত্যন- বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি, কিন' উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউইয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না অবশেষে সর্ব সম্মতিক্রমে সি'র হল, অবস'াটার সরেজমিন তদন- হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের। নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণেই লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল-অর্থ এবং সময় দুই দিকে থেকে। নিজেকে আর্টিষ্ট বল পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহেতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্যে আর্ট সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে আঁকা ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন' দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন-দেশকে সযত্নে কন্টকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন' আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান-। তার মুখ ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই আনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোষ্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো, এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালার রেজিষ্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন সব কোঠায় যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা- কর্পুরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-

বিকীর্ণ ইংরেজী ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, অমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংল্যান্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কন্ঠস্বরে এইরকম গদ্গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিত শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ। কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা, বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেনস। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কোটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্তি হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস'া প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স'ায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, আন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছের রাখবার সাধনা সুসম্পর্ন। আর যখন সুমার্জিতনখররমনীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গ রূপে ততটা ধুমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন-া উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ- খুরওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভুত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়। সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায় নি, কিন' ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গন আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন বলন টগবগ করছে-উপাসকমন্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা; এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান-রের জয়তোরণ, কিন' অনবচ্ছিন্ন খোপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ। পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন' উত্তরচ্ছদে অসমবতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে, অকারণ দস-ানা পরা অভ্যস- অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন' পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল। বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্ট্মাসের প্লাম পুডিং এবং পৌষপার্বনের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন' নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোট বোধ করে। অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত, এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবন্য গর্ভনেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার

স্পেশাল ক্রিয়েশন। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে। ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস-ক্ষেপ করতে হবে। চতুরমুখ তার চোর জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিটে নির্বোধ করে। তাই স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয় মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য। আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হাওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি। প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘর এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক চাঁচা, মাজা, ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপরে যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারন মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস- বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ সেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ। সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, 'দুর থেকে আমরা মনে করেছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ যাতে বলে গ্রীন, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস'্যকর, কিন' আগেকার মতো ইনটারেসটিঙনয়। অমিত ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, ' প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহ মনে প্রাণে,যাকে কবি বলেছেন সঁঃব রহংবহংধঃব ঃযরহমং' শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই; যারা অত্যন- বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগলভতায় সুপটু তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা। ওরা আশা করেছিল, লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সমপ্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে তার পর মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়া হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে। অমিত ক্ষনে ক্ষনে বেরিয়ে যায়। বলে, 'খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।' খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের আগোচর ছিল না। কিন' তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান- যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, ' চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।' কিন' প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর

তার গতিটা কোন্ অভিমুখী তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধু সওদা করতে চলেছে। মেয়েদুটি নিতান-নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতুহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মুধকরের ডানায় চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু সি'র করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে?

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারান্ডায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোযাকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষায়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না। এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য। কেটি টক্ টক্ করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, ' দুঃখিত।' লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, কাকে চান আপনারা?. কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যের আপাদমস-কে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, ' মিস্টার অমট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।' লাবণ্য হাঠাৎ বুঝতেই পারলে না 'অমিট্রায়ে' কোন্ জাতের জীব। বললে, ' তাঁকে তো আমরা চিনি নে।' অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুষ্চকিত চোখ-ঠরাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়হাসির রেখা কেটি ঝাজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, ' আমরা তো জানি এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া আশা আছে ড়ভঃবহবৎ ঃযধহ রং মড়ড়ফ ভড়ৎ যরস' ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আরও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস'ত হয়ে বললে, ' কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।' লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, ' তোমার টিচার?' ' হা।' ' নাম বুঝি লাবণ্য।' ' হা।' ' গট ম্যাচেস?' হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝলে না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেটি বললে, ' দেশালাই।' সুরমা দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ' ইংরেজি পড়।' সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, 'গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানারস্ শেখে নি।' তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। ' ফেমাস লাবণ্য। ডিল্লীশস্ ! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভুমিকম্পে অমিটের হৃদয়ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার সিলি! মেন আর ফানি!' সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারন ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতে ও ভুমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন' এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যপার! এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত ধরনে কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন এতকাল ভিজে ন্যাকড়া; কাছে বসলে মানটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে। ' সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাটে। কোন এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।' এই বলে

টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর শিকল ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল নিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কান্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস- রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়ন বিহারীনি মেকি এঞ্জেলদের' পরে। দাদা সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকনি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। এমন সময়ে দাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবন্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া চুলে- দুইচোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি-নাম ধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রানের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহন করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াহাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ঘরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, ' নটি ডগ!' কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন- নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার' পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না বিধাতার স্বহসে-তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো। সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একুট আভাস দিয়ে বললে, ' আমি সিসি, অমির বোন।' যোগমায়া একটু হেসে বললেন, ' অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা!' কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, ' এসো মা, ঘরে বসবে এসো।' সিসি বললে, ' সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি অমি এসেছে কিনা।' যোগমায়া বললেন, 'এখনো আসে নি।' ' কখন আসবেন জানেন?' ' ঠিক বলতে পারি নে। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।' কেটি তার স্বস'ানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, ' যে মাষ্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে আমিটাকে সে কোনোকালে জানেই না।' যোগমায়া বাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। ক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, ' শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তার খবর আপনাদেরই জানা আছে।' কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করে ই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, লুকোতে পারো, ফাঁকি দিতে পরাবে না। আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন' সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাকে স্পষ্ট আবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোন বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না। কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস- -একটু সে বিরোধ সয় না কর্কশ ব্যবহারে তার কোন সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুন্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোন লক্ষণ দেখলে তাকে সে অসি'র করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের-সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে

ততই তার নকল করে; দেখাতে যা সে দুর্বল নয়। সব সময় পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডড়াটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রু এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখর উপর ও তুড়ি মারতে প্রস'ত-ঃযধঃ সঁপয ভড়ৎ রঃ!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপসি'ত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে, পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান-রের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরাম-কেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এই খানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবন্যর শাসন কড়া, সরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্য বিকেলে সাড়ে চারটে বেলা চা-পান সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনো প্রকার তৃষ্ণা নিবারণের সৌজন্য সম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথা নির্দিষ্ট সময়ে এখানে যে আসত। আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কোলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবন্যকে পরাবে তার সমস- অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে, 'একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেচিল, কিন' তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি তুমি খাটো করে রেখেছ-সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।' অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, 'ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি; কিন' ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়; ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মুল্য জানবে কী করে?' অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে যেমন বহুদিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠান্ডা দেখে আর থার্মোমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ। বারান্দার যে কোনাটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস-া দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, ' নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গে মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়।' আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে। নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর

ঘরের বাইরে স-ম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম মৈত্রীর উচ্ছাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠ। সিনি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে এই সদভাবে প্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না। দুই সখীর প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে ' মাসি' বলে দুর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, ' মাসিমা, লাবণ্য কোথায়?' ' কী জানি বাছা, ' মাসিমা, লাবণ্য কোথায় আছে?' ' এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।' ' বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।' ' চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।' যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে। সিসি একটু ঁেচচিয়ে বলে উঠল, ' অপমান! চলো কেটি, ঘরে যাই।' কেটিও কম জ্বলে নি। কিন' শেষ পর্যন- না দেখে সে যেতে চায় না। সিসি বললে, 'কোনো ফল হবে না।' কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, 'হতেই হবে ফল।' আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, 'চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।' কেটি বারান্দায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, ' এইখানে দিয়ে তাকে বোরোতেই তো হবে।' অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শানি- তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল। অমিত বললে, ' মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখিছিলেন কিন- রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।' ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁসফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে; এমন অবস'ায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্র গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কাল-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেই কেই স্বরে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল। এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, 'সিসি, এরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন' বোধ হচ্ছে আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছে। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ সি'র হয়ে গেছে, কলকাতায়, অঘ্রান মাসে।' কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে,'আই কন্গ্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে; রাস-া কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনি এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে'। সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল। লাবণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন' মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না। অমিত তাকে বললে,

‘আজ বেরোবার সময় । এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল‘কোথায় যাচ্ছ’। আমি বলেছিলুম ‘বন্য মধুর সন্ধানে’। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন কথাটা যে হাসির নয় লোক সেটা ঠাওরাতে পারে না। কেটি শাস- স্বরেই বললে, ‘কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।’ ‘কী করতে হবে বলো’ ‘নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টলম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝর্ণা, যত মধুর দোকান আছে, সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে রিষফ মড়ড়ংব. সিসি কোনা কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে,‘মনে পড়ছে সেই গল্পটা, একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন্ পার্সিয়ান ফিলজফার তার পাগড়িচোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস’ানে এসে বসেছিল। বলেছিল পালাবে কোথায়? মিস্ লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না, আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল; কিন’ আমার মন বললে ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস’ানে আসতেই হবে।’ সিসি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল। কেটি লাবণ্যকে বললে,‘অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সান্ডে স্কুলের বিধানমত ফল ফলল না, দন্ডদাতা আপনাদের কোনো দন্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজানাকে একজন এক দৃষ্টিতে জানলেন- এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়। সিসির আমার সেই উচ্চহাসি।ট্যাবি কুকুরটা এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালো। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল। কেটি বললে, অমিট তুমি জান, এই হীরের যদি হারি জগতে আমার সান-্বনা থাকবে না। এ আংকটি একদিন তুমিই দিয়েছিল। এক মূহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোওয়াতে হবে? সিসি বললে, বাজি রাখাত গেলে কেন ভাই। ‘মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল, এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। ত, এমন অদ্ভূত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আংকটি দিয়েছিলে কেন? সে দেওয়ার মধ্যে কি কোন বাঁধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটাতে দেবে না?’ বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে। আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংল্যান্ডে। আকসফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস- আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাটে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্রের ধরনী তার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষনে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে; তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন’ কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কোটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা

পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে বলেছিল- ঞবহফবৎ রং ঃযব হরমযঃ অহফ যধষঢু ঃযব য়ঁববহ সড়ড়হ রং ড়হ যবৎ ঃযৎড়হব.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল 'মনআমী', ফরাসি ভাষায়, যার নাম হচ্ছে 'বধু'। কেটি বললে, বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।' ব'লে আংটি খুলে টেবিলটার উপরে রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল করা মুখের উপর দিয়ে দর দর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল .

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যের হাতে, শোভনলালের লেখা- শিলঙ কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাসি- পেয়েছি, কিন' কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন- স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শানি- পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর- কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখে জলে ভরে এল। মুছে ফেললে; চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত, অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস- জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন' সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিককার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধুলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল; সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতে বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুন্ঠিত ব্যথিত মুর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন-রিক মাহাত্ম্যে। লাবণ্য চিঠিতে লিখলে- তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে! চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই। চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, ' বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।' অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল; ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না। লাবণ্য সহজেই বললে, ' চলো।' দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আসে- আসে- সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সে

দিকে মুখ করে দাড়িয়ে রইল। লাবণ্য আসে- আসে- বললে, ‘ একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিল, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?’ অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, ‘ তোমাকে সব কথা বোঝার কেমন করে বন্যা? সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ? লাবণ্য বললে, ‘ তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর-একজন তোমার অনাদরে গড়া।’ অমিত বললে, কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি, তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।’ ‘ কিন’ মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মুর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক গে ও সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।’ ‘বলো, নিশ্চয় রাখব।’ ‘ অন-ত হপ্তাখানকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেরিয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো, ওকে আমোদ দিতে পারবে।’ অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, ‘ আচ্ছা।’ তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস- ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।, এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আসে- আসে- পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোন বাধা দিলে না। সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অন-রশ্মি উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান- দীপ্তিতে লাবণ্য আপন আপন মুখ তুলে ধরলে, অমিতর নত মুখের দিকে। সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, ক সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি। সেই য়ুক্যালিপটাস তলায় অমিত এসে দাড়ালম খানিকক্ষণ ধরে শূণ্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, ‘ ঘরে খুলে দেব কি? ভিতরে বসবেন?’ অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, ‘ হ্যা।’ ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেলফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই একটা ছেঁড়া শুন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যের নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে। পেনসিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার ঘাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মুর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না। তার পরে শরীরে মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন; মনে হল যেন শুনতে পেলে শান- মধুর স্বরে তাঁর আহবান-‘বাছা!’

সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে। সমস- শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

কোলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেনসি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিআয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে না না বই পড়ে, না না অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামন্ডে। একদিন শুনলে, অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান-র করা। এতদিন অমিত মুর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বডডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে । বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিনফিনে শানি-পুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে কেয়া বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে, আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের ‘ নিরুদ্দেশ যাত্রা’। কিন’, লোকে কী না বলে? যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র, কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজে মুখে একদিন ও যতি এ প্রসঙ্গে শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজী বই কিনে উপহার দেয়, কিন’ তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে সব বইয়ের আলোচনা করে না; যদি বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর ‘ নিরুদ্দেশ যাত্রার পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, ‘ অমিতদা, শুনলুম মিস্ মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে।’

অমিত একটু খানি চুপ করে থেকে বললে, ‘ লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে?’

‘না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।’

খবরটা সত্যি, কিন’ লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।’

যতি হেসে বললে, ‘ এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।’

‘দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই মানব জীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।’

যতি বললে, ‘অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়?’

‘ আমি বলছি বিবাহের হাজারখানা মানে। মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।’

‘ তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।’

‘ সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মুল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর একটা কথায় গিয়ে পড়ব; ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান-।’

‘ তা হলে, অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয়ে যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।’ ‘ তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারে খতম করতে হবে।’

‘ এই আলোচনাটা যদি নিতান-ই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খতম করতে দোষ নেই।’

‘ ধরে নাও-না প্রাণের গরজেই।’

‘ শাবাশ, তবে শোনো।’

এই খানে একটু পাদটীকা লাগলে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারনেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বন-ঃকরণের ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, ‘ অক্সিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না, আবার অক্সিজেন আর-এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার-দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?’

‘ সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝা বার ইচ্ছে আছে।’

‘ যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষ ভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।’

‘ তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।’

অমিত বললে, ‘ একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন’ আমার আকাশও রইল।’

‘ কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?’

‘ জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে, কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিকে থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।’

‘ কিন্তু-’

‘ কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোমানস্ সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যানসের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি? কিছুতেই না। আমার রোমানস আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে ঘেল রোম্যানস, আমার মর্তেও ঘটাব রোম্যানস। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তার হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যানসের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স’লেও উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।’

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগনা। অমিত তার মুখ দেখেই ঈষৎ হেসে বললে, ‘ দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়, কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন’ সে যেন ঘড়ায় তোলা জল প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার ভালোবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।’

যতি একটু কুন্ঠিত হয়ে বললে, ‘ কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই বেছে নিতে হয় না?’

‘ যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।’

‘ কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি-’

‘ তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছে নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।’

‘ তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।’

‘ নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌছিয়ে দেবে?’

‘ দেব।’

অমিতর এই চিঠি-

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তায় শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই মুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর- কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়ছে সেদিন মরেছে, অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে-

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি,
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।
জীবন আঁধার হলে সেইক্ষনে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

–মিতা

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরাম-কেদারায় বসে সামনে চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জৈষ্ঠ্য মাসে, রামগড়পর্বতের শিখরে। অপর পাতে-

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন-
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ ফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল-
তুলে নিল দ্রুত রথে
দুঃসাহসী ভ্রমনের পথে

তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখরচুড়ায়;
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দুর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।
কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যতিবে আকাশ,
সেই ক্ষনে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রানে-; বিস্মৃতি প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়-
সে আমার প্রেম,
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।
তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।

মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা–
পুজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধুলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজও তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।
মোর লাগি করিয়ো না শোক–
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যের করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকন্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়

অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছে নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গন্ডুষ ভরিয়া করে পান
হৃদয় অঞ্জলি হতে মম।
ওমো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্য্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহন করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়।
বন্যা
২৫ জুন ১৯২৮
ব্যালাবুয়ি। বাঙ্গালোর।